মেঘের কোলে রোদ

এনামুল হক ইবনে ইউসুফ

রাইয়ান
প্রকাশন

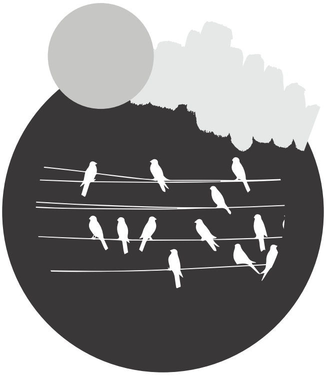

এক.

সন্ধ্যের পরপর ধীরপায়ে আমরা চারজন রিপন মামার চায়ের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালাম। চারজন বলতে আমি, তাইফ, সামিউল এবং জিহাদ।

চাইনিজের গলির ভেতরে ঢুকে কয়েক কদম হেঁটে এগোলেই সাইনবোর্ডে বড় বড় অক্ষরে "রিপন টি-স্টল" লেখাটা নজর কাড়ে। সাইনবোর্ডের এক কোণে আবার ছোট ছোট অক্ষরে লেখা আছে, ৪৯/১০, দক্ষিণ বিশিল, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬। মোবাইলঃ ০১৭...।

বড় বড় দু-টো ডেকচীতে হাল্কা আঁচে জ্বালানো হচ্ছে দুধ। সেই সাথে হরেক পদের রঙ-চা আর নানান মুখরোচক খাবারে এ এক বিরাট জমকালো আয়োজন। দোকানের সামনেই বেশ বড়সড় একটা চার্ট টাঙানো। তাতে লেখা আছে, রঙ-চা দশ টাকা। স্পেশাল আদা-লেবু চা পনের টাকা। দুধ-চা (জেনারেল) পনের টাকা। স্পেশাল মালাই-চা ত্রিশ টাকা। বেনসন এক সলাকা পনের টাকা। মালবোরো এক সলাকা পনের টাকা। গোল্ড লিফ...ইত্যাদি ইত্যাদি।

রিপন টি-স্টল, নামে চায়ের দোকান হলেও 'চায়ের দোকান' বললে আমার মতো পাড়াগাঁয় বেড়ে ওঠা ছেলে-ছোকরা কিংবা বুড়োদের চোখে যে দৃশ্য ভেসে ওঠে তার সাথে রিপন মামার এই দোকানের খুব একটা মিল নেই।

হাত পাঁচেক চওড়া আর প্রায় পনের-ষোল হাত লম্বা দোকানের দু-পাশে বেঞ্চি পাতা। ছোট-বড়-মাঝারি সাইজের তিন তিনটা ফ্রিজ। তাতে ঠেসে ভরা আছে বাহারি রঙ আর স্বাদের কোমল পানীয়। আছে আইসক্রিম, দধি, মাঠা, লাচ্চিসহ আরও কত্ত কী! এক পাশে পানির ফিল্টার। তাতে আবার দুটো নল। একটায় নরমাল পানি অন্যটায় ঠান্ডা। ফিল্টারের গায়ে সেটে দেয়া ছোট কাগজের ওপরে কাটা কাটা আধুনিক যন্ত্রের হাতে লেখা "প্রতি গ্লাস পানি মাত্র ২ টাকা।"

সান্ধ্যকালীন এই সময়টায় ক্রেতাদের বেশ উপচে পড়া ভিড় লেগে থাকে রিপন মামার দোকানে। নানান বয়সের, নানান রুচির সেই সমস্ত ক্রেতাদের মনোরঞ্জনে

তাই দোকানীকেও কম কসরত করতে হয় না।

সারাদিন অফিসে গাধার খাটুনি শেষে এক কাপ কড়া লিকারের লাল চা আর এক শলাকা বেনসন অথবা মালবোরোতে রোজকার গল্পের আসর জমে ওঠে কলিগদের মাঝে। কেউ-বা আবার একাকী এক কোণে বসে পায়ের ওপর পা তুলে ফেসবুক স্ক্রোলিং নিয়ে ব্যস্ত। এক হাতে জ্বলন্ত সিগারেট অন্যহাতে বোকা বাক্স।

কখনো-বা দেখতে পাওয়া যায় নবাগত প্রেমিকার পাশে বসে সদ্য কলেজ পড়ুয়া ছেলেটা উষ্ণ কফির মগে রাজ্যের কত স্বপ্ন এঁকে চলেছে। পাশের বেঞ্চিতে ষাটোর্ধ বৃদ্ধ হয়তো ওদের দেখেই যৌবনের ওপাড় থেকে ফেলে আসা অতীত খুঁজে বার করতে লেগে পড়েছেন।

চায়ের কাঁপে ঠোঁট ভিজিয়ে নানান কথার ফাঁকে আমাদের সান্ধ্য আড্ডাটা জমে উঠল ক্যারিয়ার ভাবনা নিয়ে। এইতো আর কিছুদিন পরেই গ্রাজুয়েশন শেষ হতে যাচ্ছে। এরপর কে কী করব, কোথায় থাকব এসব নিয়েই কথা হচ্ছে নিজেদের ভেতর।

জিহাদ সেই শুরু থেকেই বিদেশ যাব, বিদেশ যাব করছিল। একাডেমিক পড়ালেখার পাশাপাশি ও তাই টুকিটাকি ইংরেজিও প্রাক্টিস করত। গ্রাজুয়েশন শেষ হলেই নাকি আবার আইএলটসও দেবে।

সামিউল মেধাবী ছাত্র, বিদেশ যাবার ইচ্ছেটা সেরকম না থাকলেও ভালো একটা সরকারি চাকরি পাবার স্বপ্নটা হৃদয়ে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে ওর। মাথার ওপর শক্ত একটা ছাদ, ব্যাংকের লকারে জমানো কিছু টাকা আর পরমা সুন্দরী একজন স্ত্রী।

তবে শুধু কি স্বপ্ন দেখলেই হবে? স্বপ্ন পূরণ করতে গেলে চাই কঠোর পরিশ্রম, তাই না? তাই তো রোজ রাত করে ক্লাস শেষে বাসায় ফিরে আমরা যখন ক্লান্তিতে হাত-পা দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিতাম সামিউল তখন কোনো রকম নাকেমুখে পানি ছিটিয়েই প্রশ্ন ব্যাংক খুলে বসে পড়ত। এসাইনমেন্ট, ক্লাসটেস্ট, প্রাক্টিক্যালের ফুলঝুড়িতে আমাদের মন-মস্তিস্ক যখন চরমে, ছেলেটা তখনো দিব্যি এসি সার্কিট, ডিসি সার্কিটের জটিল জটিল ইকুয়েশান সলভে মত্ত থাকত। ওর মতো ছাত্রদের এটাই স্বাভাবিক জীবনবিধি অবশ্য; কিন্তু তাইফের মাঝে সেরকম কোনো তাড়া আমি দেখিনি কখনো।

প্ল্যান কী জিজ্ঞেস করলেই মুচকি হেসে বলত, ‘ভাগ্যে যা আছে, তাই!’ অথচ মেধায় কোনো অংশেই পিছিয়ে ছিল না ও। রেজাল্টও প্রতি সেমিস্টারে সেভেন জিরো’র ওপরে।

এদিকে আমার প্ল্যান ফাইনালটা কোনো রকম শেষ হলেই কোনো একটা প্রাইভেট ফার্মে ঢুকে পড়ব। রাত জেগে জেগে সামিউলের মতো প্রশ্ন ব্যাংক আর বড় বড় সার্কিট সলব করবার এখন আর শক্তি আর ইচ্ছে কোনোটাই আমার নেই। গত আটটা বছর বসে বসে তো এই-ই করলাম। বাপের লাখ লাখ টাকা গচ্ছা দিয়ে সার্টিফিকেট গোছালাম, আর কত?

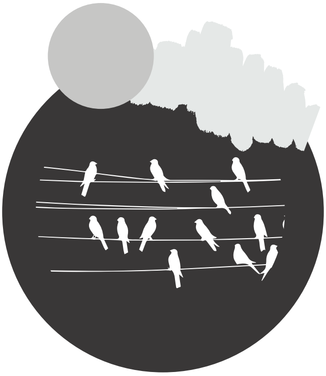

দুই.

দোকানে চায়ের বিল মিটিয়ে রাস্তায় বের হতেই তাইফ বলল, চল কুয়েতি মসজিদের সামনে যাই একবার। একটা টুপি কিনব; সালাতে দাঁড়ালে এই টুপির সাথে আমার রীতিমতো ধস্তাধস্তি হয়।

মাথায় হাত দিয়ে সুতির পাতলা টুপিটা খুলে পাঞ্জাবীর পকেটে পুরে তাইফ হাঁটতে শুরু করল। আমরাও ওর পিছু পিছু পা চালালাম।

মিরপুর হাইওয়ের নিয়ন বাতিগুলো একে একে জ্বলে উঠেছে ততক্ষণে। দু-ধারে পাহাড়ের ন্যায় উঁচুনিচু শপিংমলের সিলিং-এ ঝুলছে রঙবেরঙের আলোকসজ্জা। এসির ঠাণ্ডা হাওয়ায় শো-রুমের কর্মীরা যখন ক্রেতা আর ক্যাশবাক্স সামলাচ্ছে, ব্যস্তসমস্ত হয়ে নীড়ে ফেরা পাখির মতো ঘরমুখো মানুষদের ভিড়ে রাস্তায় তখন তিল ঠাই নেই অবস্থা। বাস-ট্রাক-রিক্সা-ভ্যান-সিএনজিতে বিশাল জ্যাম বেঁধে বসে আছে। ভ্যাপসা গরমে প্রাণগুলো যেন এখন আকাশের দিকে তাকিয়ে বলছে, ছেড়ে দে মা....!

বাসের খোলা জানালার ভেতর দিয়ে মাথা বের করে ক্লান্ত দু-চোখ হয়তো খুঁজে বেড়াচ্ছে আপন ঠিকানা। আদুরে সন্তান। হাত থেকে বাজারের ব্যাগ চেয়ে নিয়ে বিছানার পাশে বসে হাত পাখা নাড়তে নাড়তে ভরসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা চিরচেনা সেই মুখ। হয়তো বলবে—বাড়িতে ফিরতে এতক্ষণ লাগে বুঝি খুকির বাপ? আপনের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে মাইয়াডা যে ঘুমাইয়া গেল!

ফুটপাতের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি আমরা। রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা একেকটি যন্ত্রদানবের পেটের ভেতর হাসফাঁস করতে থাকা মানুষগুলোকে এই মুহূর্তে দেখতে ঠিক যেন চিড়িয়াখানার জন্তুদের মতো ঠেকছে। দু-পায়ের অদ্ভুদ চিড়িয়া। অপেক্ষিত চোখ মেলে তাকিয়ে আছে ট্রাফিক নামক বর্বরতার দিকে। লাল থেকে সবুজ হবার অপেক্ষা। কিন্তু এ অপেক্ষা যেন আজ আর ফুরোবার নয়।

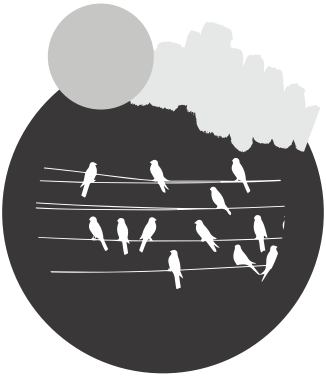

তিন.

কুয়েতি মসজিদের কাছাকাছি আসতেই ফুটপাতের ওপর মসজিদ গেটের পাশেই লাগোয়া সেই দোকানটা চোখে পড়ল। এদিকটায় ভিড়টা খানিক পাতলা। নানান পদের টুপি, জায়নামাজ, তসবীহ, মেসওয়াকসহ মাতাল করা সব খুশবুর পশরা সাজিয়ে বছর পচিশ-ছাব্বিশের নাদুস-নুদুস এক যুবক আসন পেতে বসে আছে। আমরা কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই আতরের মিষ্টি সেই ঘ্রাণ মুহূর্তেই দেহ-মন আচ্ছন্ন করে ফেলল।

দেখলাম এক মাঝ বয়সী ভদ্রলোক রাস্তা থেকে উঠে এসে আগ বাড়িয়ে দোকানীর থেকে হাত পেতে এক চিমটি খুশবু চেয়ে নিলেন। এরপর হাতের উল্টোপাশটা নাকের সাথে ঘষতে ঘষতে ফের আপন গন্তব্যে ছুট লাগালেন।

তাইফ ওর পছন্দসই টুপি হাতরে বেড়াচ্ছে; ওকে সাহায্য করছে সামিউল। জিহাদ মেসওয়াকগুলো উল্টেপাল্টে দেখছে আর মনে মনে কী যেন ভাবছে। আমি পাশেই এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ওদের কাণ্ড দেখছি। তাইফ খুব সুন্দর একটা সাদা রঙের টুপি মাথায় দিল।

উঁহু হচ্ছে না। মাথা বড়। টুপি ছোট। তাইফের চোখেমুখে নিষ্পাপ আক্ষেপ। আসলে এরকমটাই হয়। পছন্দের জিনিসগুলোর সাথে আমাদের মিলের থেকে অমিলই বেশী থাকে।

যা-ই হোক আক্ষেপ ভুলে আবারও খোঁজাখুঁজি শুরু হলো। বেশকিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর সাইজমতো একটা টুপি অবশ্য মিলেও গেল কিন্তু রঙটা টকটকে গাঢ় লাল। মনে হচ্ছে বরের টুপি। এক্ষুণি শেরোয়ানি সমেত এই টুপিটা মাথায় চাপিয়ে তাইফ গিয়ে সোজা বিয়ের পিঁড়িতে বসবে।

কাজি সাহেব বলবেন, বল বাবা কবুল!

কবুল আর বলা হলো না তাইফের। আমার হুঁশ ফিরল দোকানীর গলার স্বরে।

লোকটা দেখতে যেমনি সুপুরুষ কণ্ঠও তেমনি দারাজ। কথা শুনলে মনে হয় যেন স্লেটের ওপর খুব জোরেসোরে কেউ চক টেনে টেনে লিখে যাচ্ছে।

আমাকে বলেন মামা কোন ধনের টুপি চাই আপনার? এইখানে অনেক আইটেমের টুপি আছে। সব তো আর আপনার পছন্দমাফিক হবে না,তাই এভাবে আউলায়েন না মামা।

দোকানীর এমন আচরণে তাইফটা যেন খানিক দমে গেল। পাশ থেকে সামিউল বলে উঠল, মামা এরকম একটা সাদা রঙের টুপি দেখান তো। এটা বেশ ছোট।

এরপর প্রথমে ও সাদা রঙের বে-সাইজের যে টুপিটা তাইফের হাতে দিয়েছিল,সেটা হাতে নিয়ে দোকানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করল। দোকানীকেও দেখলাম মাথা ঝাঁকিয়ে বুঝতে পেরেছি টাইপ ভঙ্গিতে ইশারা করল।

এদিকে জিহাদ বাবাজি, হাতে একটা মেসওয়াকের ডাল ভর্তি প্যাকেট নিয়ে সেই তখন থেকে কী যেন গবেষণা করছে। সিম্পল একটা গাছের ডালের ভেতর কী এমন বিশেষত্ব আছে যার জন্য এত কায়দা-কানুন করা—বোধহয় সেটাই বোঝার চেষ্টা করছিল ও। তবে খুব সম্ভবত গবেষণায় আশানুরূপ ফলাফল মেলেনি। সেজন্য দোকানীর দিকে সেই প্যাকেটটা উঁচিয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল, মামা এটার দাম কত?

আশি টাকা

আশি টাকা? কথাটা শুনে ছেলেটা যেন আকাশ থেকে পড়ল। বিঘত খানেক লম্বা একটা ডালের দাম আশি টাকা?

আরে কী বলেন মামা, এত দাম কেন? আচ্ছা তাহলে এটা কত?

জিহাদ সরু অথচ আগেরটার থেকে খানিক মোটা এবং চকচকা আর একটা ডাল ভর্তি প্যাকেট উঁচিয়ে দোকানীকে দেখাল।

মামা এটার দাম বিশ।

জিহাদের চোখজোড়া ছানাবড়া হয়ে গেল। মনে মনে বুঝি গালমন্দই দিল। দেয়াটাই অবশ্য স্বাভাবিক। যে ছেলে আজীবন তুলতুলে নরম ব্রাশ আর টুথপেস্টে দাঁত মেজে বড় হয়েছে তার কাছে মেসওয়াক তো অষ্টাচর্য। তার ওপর আবার উল্টাপাল্টা দাম।

যেটা মোটা, দেখতে চকচকা সেটার দাম বিশ অথচ যেটা ফিনফিনে আর কালো চামড়ার সেটার দাম আশি? বোকা বানানো হচ্ছে বুঝি?

জিহাদের মনের ভেতর চলতে থাকা প্রশ্নঝড় অবশেষে তাইফের কথায় মাঝপথে থেমে গেল। জবাবটা অবশ্য দোকানীই দিত; কিন্তু তাইফকে মুখ খুলতে দেখে তিনি

বোধহয় যেচে শক্তি খরচা করতে গেলেন না আর। প্রতি মুহূর্তেই এরকম কত খোদ্দেরের সাথেই তো তাকে প্রশ্ন-উত্তর পর্ব খেলতে হয়।

তাইফ বলল, আরে যেটা চকচকা আর মোটা ওটা হচ্ছে পিলু গাছের ডাল, সেজন্য এটার দাম কম। বিশ টাকা। আর কালোটা হলো অরিজিনাল জইতুন। সেজন্য এত দামি। আশি টাকা। বুঝলি?

জিহাদ মাথা ঝাঁকালো। কী বুঝল কে জানে? পরক্ষণেই জইতুনের ডালটা তুলে দোকানীকে উদ্দেশ্য করে বলল, মামা এটা চল্লিশ টাকা দেব; দেন।

আমি তো অবাক। কী বলে ব্যাটা। এই না সবে তাইফ ওরে সব বুঝিয়ে-শুনিয়ে দিল।

অবশ্য ওর এই এক বাতিক। দামাদামির বিন্দুমাত্র অবকাশ পেলেও সেটুকু সুযোগ হাতছাড়া করতে ও নারাজ। সেজন্যেই তাইফ ওর নাম দিয়েছে "একুরেট জিহাদ"।

এই তো সেদিনের কথা, মিরপুর এক নাম্বারের বড় বাজারে আমি আর জিহাদ মাছ কিনতে গেলাম। বিঘত বিঘত রূপোলি কারুকার্য করা একেকটা পাবদা মাছ। কী সুন্দর আর টাটকা দেখতে! যেন পানিতে ছেড়ে দিলে এখনই দৌড়ে চলে যাবে। দোকানীর কাছে দাম হাকতেই তিনি বললেন, এক দাম চারশ টাকা কেজি।

আজকাল সব জায়গাতেই এই একটা জিনিস বেশ বাড়াবাড়ি রকমের শোনা যাচ্ছে। সেদিন গুলিস্থান গিয়েছিলাম কাজে। ফেরার পথে ফুটপাতের একটা দোকান থেকে বেছে বেছে দু-তিনটা পাতলা দেখে গেঞ্জি বের করে দোকানীকে দাম জিজ্ঞেস করতেই, মামা একদাম তিনশ।

শুধু কি তাই? ফিরবার পথে শাহবাগ থেকে এক হকার উঠল বাসে। মোবাইলের চার্জার, ইয়ারফোন, কভার আরও কী কী যেন বিক্রি করছে। সেও দেখলাম সেই একই ফিরিস্তি দিচ্ছে, কী অদ্ভুদ!

যা-ই হোক, মেজাজ সাময়িকের জন্য বিগড়ে গেলেও নিজেদের সামলে নিয়ে দরদাম করতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত দোকানী এই মর্মে রাজি হলো যে, হাফ কেজি নিলে দুইশ আর এক কেজি সাড়ে তিনশ।

ব্যস! জিহাদও আর দেরি করল না। মাছের পেট টিপে টিপে পলিথিনে ভরে মেপেটেপে নিয়ে পকেট থেকে যেই টাকাটা বের করে ওনার হাতে দিল তখনই দোকানী খাঁড়ার উপরে পল্টি।

নাহ মামা, দাম তো চারশ। এক টাকাও কম নিমু না। মাছ না নিলে নাই।

ফেরত দেন।

ঢাকা যখন প্রথম আসি তখন বাড়ি থেকে বারবার করে বলে দিয়েছিল যে, ঢাকার মানুষ ভালো না। এরা ক্ষণে ক্ষণে গিরগিটির মতো রঙ বদলায়। কিন্তু এই ব্যাটা তো দেখছি কথায় কথায় রঙ পাল্টাতে পারে। শিখলো কই এসব?

জিহাদ ততক্ষণে ক্ষেপে উঠেছে। ওর মুলোর মতো সুন্দর গাল দুটো জবার মতো লাল হয়ে উঠেছে মুহূর্তেই।

আমাদের পাশেই একজন লোক দাঁড়িয়েছিলেন। এখানকার কেউ, নাকি থার্ড পার্টি ঠিক জানি না তবে ওনাকে আর যিনি পালায় মেপে ওজন দিলেন তাকেও দেখলাম আমাদের হয়ে সাফাই গাইছেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। উল্টো জল ক্রমশ ঘোলাটে হছে দেখে আমিই এক সময় দোকানীর হাত থেকে টাকাটা এক প্রকারের ছিনিয়ে নিয়ে জিহাদের হাত থেকে মাছ ভর্তি পলিথিন ব্যাগটা তার দিকে ছুড়ে মারলাম।

জিহাদ কিছুতেই নড়বে না ওর জায়গা থেকে। ওর কথা হচ্ছে, আপনি কেন জবান দিয়ে এখন আবার সেই কথা ঘোরাচ্ছেন? আমাকে মিথ্যুক বানাচ্ছেন। আপনার সাথে আমি কি মজা করতে এসেছি এখানে?

পরিস্থিতি বুঝি হাতাহাতির দিকেই যাচ্ছে। কী করব বুঝতে না পেরে ওর অমন দস্তুর মতো শরীরটাকে ঠেলতে ঠেলতে ওখান থেকে সরে পড়লাম।

ব্যাটার ওপর অবশ্য আমিও রেগেছিলাম। মাথায় টুপি দেখে আমাকে সাক্ষী বানানো? নিজে মিথ্যে বলে আমাকে বলে কি-না, আপনে তো মামা নামায পইড়া আইছেন, আপনিই বিচার করেন!

এই তো মেজাজটা গেল বিগড়ে। অবশ্য বিচার শেষ পর্যন্ত আমিই করেছিলাম। ঠিক একটু পরেই ওনার সামনে দিয়ে বড় একটা রুঈ মাছ আর বিঘত খানেক লম্বা লম্বা পাবদা কিনে নাচাতে নাচাতে বাজার থেকে বেরিয়ে এলাম।

গোটা রাস্তা জিহাদের সেই একটাই কথা, শালা আমাকে চেনে ও? নিজের জবানের ঠিক নাই ও আমাকে দোষী বানাতে চায়।

বুঝলাম ইগোতে বেশ লেগেছে ওর। অবশ্য সেটাই কি স্বাভাবিক নয়? আমিও তাই আর কথা না বাড়িয়ে জোড়ে জোড়ে পা চালালাম। বাসায় ফিরে সবিস্তারে ঘটনাটা শোনার পর তাইফ তো হেসেই খুন।

আরিব্বাস! মাছওয়ালা কামড়া করল কী? একুরেট জিহাদের সাথে পাঙ্গা ? সে

কি জানে না যে জিহাদ ভাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছেলে। ব্যস! শেষ কথাটা শুনে গোটা ফ্ল্যাট যেন হাসির জোয়ারে ভেসে গেল।

সেই একই জিহাদ বিশ টাকার দুটো চকচকে নোট টুপিওয়ালার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দোকানী বোধহয় জীবনে এরকম খোদ্দের আর একটাও পায়নি।

এতদিন দেখেছি দোকানদাররা খোদ্দেরদের বিভ্রান্ত করে। আজ ঘটনা ঘটছে উল্টো। দোকানী রীতিমতো বিভ্রান্ত। তাইফের জন্য টুপি খোঁজা বাদ দিয়ে একধ্যানে তিনি জিহাদের দিকে তাকিয়ে আছেন।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থেকে ওকে বোধহয় একটু মেপেও নিলেন। বোধহয় বুঝতে চেষ্টা করছেন যে, সুদর্শন এই যুবক কোনোভাবে বুদ্ধিতে খাটো কি-না; কিন্তু উঁহু, সেরকম তো মনে হচ্ছে না। তবে?

পরক্ষণেই তিনি বলে উঠলেন, না মামা দাম তো আশিটাকাই। কম হবে না একটাকাও, তবে আপনি যখন চাচ্ছেন, তখন আপনার জন্য দশ টাকা নাহয় ছাড় দিতে পারি, এই আরকি। এর বেশি কিছু না।

কথায় আছে পাগলকে সাঁকো নাড়াতে বলো না। কিন্তু টুপিওয়ালা অজান্তেই সেই কাজটাই করে বসেছেন। মনে মনে আমি ভাবছি, উহুম বাবা। তুমি তো আর এই ছেলেকে চেন না। চিনলে বুঝতে এই ছেলে কি ডেঞ্জারাস আদমি হ্যায়। যে ছেলে 'ইজি'র মতো শো-রুমে গিয়ে দরদাম করতে পারে সেখানে তুমি তো কোন ছার। একুরেট জিহাদ কি আর এমনি এমনি নাম হয়েছে ওর?

কথায় কথা বাড়ে। দোকানী এবার জিহাদকে নিয়ে পড়েছে। একপক্ষ চল্লিশ টাকায় ছাড়বে না। অন্যপক্ষ চল্লিশ টাকার বেশি দেবে না। কী এক মুসিবত! আমরা নীরব দর্শক।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট জিহাদের পক্ষেই রায় শোনাল। দোকানী এক প্রকারের বেকায়দায় পড়েই হোক কিংবা লাভ-লসের অঙ্ক কষেই হোক, আশি টাকার জইতুনের মেসওয়াকটা অর্ধেক দামেই জিহাদকে দিয়ে দিল। আমি বোবায় ধরা মানুষের মতো ওর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছি। আর মনে মনে ভাবছি, শালা কামডা করল কী!

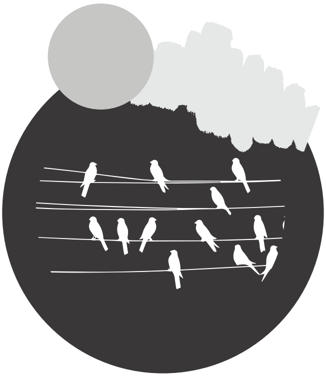

চার.

চাইনিজের মোড়ে এসে যখন দাঁড়ালাম সন্ধ্যে তখন আরও গাঢ় হয়ে এসেছে; লোডসেডিং। বিদ্যুতশূন্য শহরটা যেন এক বিরাট শোকের মিছিল। কেরোসিন বাতির নিচে পৃথিবীটা জোনাকি পোকার মতো ক্ষুদ্র। যতদূর চোখ যায় দৃষ্টি ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসে। সময় চাকায় লাগাম পরিয়ে মুহূর্ত যেন দন্ডায়মান।

গলির মুখেই ফুটপাতের ওপর অস্থায়ী এক মুড়ির দোকান। প্লাস্টিকের মোড়া টেনে আমরা চারজন গোল হয়ে বসলাম। দেয়ালের ওপাশেই গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন বনস্পতির পাতাগুলো সেই তখন থেকে কী যেন বলে যাচ্ছে ফিসফিস করে। হাতে এক প্লেট মুড়ি মাখা নিয়ে আলোশূন্য রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছি। বহুতল ভবন আর ইলেকট্রিক তারগুলো ঠেলেঠুলে দৃষ্টি গিয়ে আটকালো আকাশের গায়ে। সন্ধ্যে তারা মিটমিট করে জ্বলছে। নক্ষত্র আর মানুষে কত ব্যবধান! ট্রপোস্ফিয়ার, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার, মেসোস্ফিয়ার, থার্মোস্ফিয়ার, এক্সোস্ফিয়ার, ম্যাগনেটোস্ফিয়ার এরপর অন্তত অসীম মহাশূন্য।

কাল-পুরুষের পাশ ঘেঁষে অসংখ্য তারার মেলা। ঠিক যেন হীরের মালা ছিঁড়ে দানাগুলো ছড়িয়ে আছে ইতিউতি। এক ফালি চাঁদ লকেটের ন্যায় ঝুলে আছে ছিন্নভিন্ন সেই মেঘের সুতোর ভাঁজে। রুপোলী জোছনালোকে জগত-সংসার মায়াময় এক প্রতিচ্ছবি।

গোটা শহরটা মুহূর্তেই আবার আলোকিত হয়ে উঠল। কৃত্রিমতার আড়ালে লুকোল অকৃত্রিম চাঁদের হাসি। প্যাঁপোঁ শব্দ করে যন্ত্রদানবেরা ছুটে চলেছে ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের ন্যায়। কোলাহল বেড়ে উঠেছে রিক্টার স্কেলের মাত্রা ছাড়িয়ে। এই যেন মানুষকম্প হবে। এই যেন মেঘ, মাথার ওপর ঝুলতে থাকা চাঁদ-তারা সব খসে পড়বে কৃত্রিমতার জমিনে। আচ্ছা, মানুষ এত ব্যস্ত কেন এ শহরে? দু-দণ্ড কি বসে থেকে আকাশ দেখতে পারে না? নিজেকে নিয়ে ভিন্নভাবে ভাবতে পারে না? পরক্ষণেই মেঘের ছাউনিতে দাঁড়িয়ে চাঁদটা যেন ব্যগ্র করে বলে উঠল, 'মর্কট, এর নাম ঢাকা শহর,

জীবনান্দের ধানসিঁড়ির তীর নয় যে সবাই তোমার মতো বেকার বসে থেকে কাব্য করবে। এখানে সবাই আসেই ছুটতে, শুয়ে-বসে থাকবার জন্য সময় কই হাতে!'

বুড়ো বয়সে মানুষের নাকি ভিমরুতি ধরে। আমার মতো বেকার যুবককে তাহলে এসময় কীসে ধরেছে? রুতিভিম? পেছন থেকে সামিউলের ডাক পড়ল,

কীরে তোর খাওয়া হলো? বাসায় যাবি না?

চটকা ভেঙে তাকাতেই বেশ অবাক হলাম। তাকিয়ে দেখি আমি ফুটপাতের একেবারে পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। রাস্তার কোণে জমে থাকা পানির বুকে ভাসমান বাদাম খোসা যেন টাইটানিক। রোজ আর জ্যাক হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে আসবে এক্ষুনি। কিন্তু কথা হলো, আমি না মোড়ায় বসে ছিলাম এতক্ষণ? তাহলে এখানে এলাম কীভাবে? কখন এলাম? মাথাটা ভোঁ ভোঁ করছে। মাথা চুল্কোতে চুল্কোতে রহস্য ভেদের চেষ্টা চালাচ্ছি; পেছন থেকে আবারও ডাক, কী রে তুই কি আসবি?

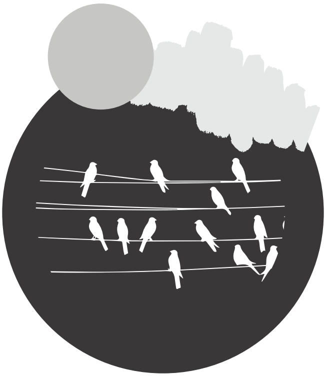

পাঁচ.

মিরপুর এড়িয়াতে এসেছি খুব বেশিদিন হয়নি। এর আগে ছিলাম শুক্রবাদ, ধানমণ্ডি। মূলত অফিসিয়ালি ছন্নছাড়া জীবন সেখান থেকেই শুরু। কয়েকজন ক্লাসমেট মিলে ভাঙাবাজারের কাছেই ছয়তলায় দুই রুমের একটা ফ্ল্যাট নিয়েছিলাম। ফ্ল্যাট বললে অবশ্য ভুল হবে কেননা, চব্বিশ হাজার টাকা ভাড়ার মধ্যে ডায়নিং আমাদের ছিল না। হার্ডবোর্ড দিয়ে টেম্পোরারি রুম বানিয়ে সেখানেও দু-তিনজন থাকত। বাড়তি আয়ের জন্য কেয়ার টেকার মজনু মামা প্রত্যক ফ্লাটেই এই কারসাজিটা করতেন; অথচ ভাড়া নেবার বেলায় আমাদের কাছ থেকে গোটা ফ্ল্যাটের ভাড়াই তিনি কড়ায় গন্ডায় হিসাব করে নিতেন।

মাথাপিছু তিন হাজার টাকা ভাড়া দিয়েও পাবলিক ইউনিভার্সিটির গণরুমের ন্যায় একজনের গায়ের সাথে একজন লেপ্টে থাকতে হতো। সবই বুঝতাম কিন্তু করার কিছুই ছিল না। কারণ, এই দুর্ভোগ ইচ্ছে করেই বাঁধানো। ঢাকা শহরে কেউ তো কারও আপন হয় না; অল্পদিনের পরিচয়ে যাদেরকে মনে হয়েছিল যে, এদের সাথে ইউনিভার্সিটি জীবনটা হেসে-খেলে-আনন্দে কাটিয়ে দেয়া যাবে তাদের সাথেই থাকব বলে সেসময় এতকিছু নিয়ে আর ভাবতাম না। কথায় আছে রতনে রতন চেনে, দিনশেষে দেখা যেত পরিবেশ ও পরিস্থিতি আমাদের সবাইকে যেখানে এনে দাঁড় করিয়েছে সেখানে আমরা সবাই-ই যেন একে অন্যের প্রতিচ্ছবি। হ্যাঁ, ব্যক্তিত্ব ভেদে আলাদা ছিলাম আমরা; কিন্তু সমষ্টিগতভাবে ছিলাম একক ও অভিন্ন। সেজন্যই তো এতগুলো দিন একই ছাদের তলায়, পাশাপাশি বালিশে কোনোরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই নির্বিঘ্নে কেটে গেছে।

দিনশেষে বাসায় ফিরে ক্লান্ত শরীরে বন্ধুরা সিগারেট ধরাত, চৈত্রের তাপদাহে ছাদ চুইয়ে খরা নামত। ফ্যানের উষ্ণ বাতাসে কুন্ডলি পাকানো রাশি রাশি সেই ধোঁয়া যখন সিলিং ছুঁত, আমি তখন ঘোর লাগা চোখে এক দৃষ্টিতে সেদিক পানে তাকিয়ে থাকতাম।